মায়া-পুরী

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৩২

মায়া-পুরী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলির
উপক্রমণিকা

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

কলিকাতা
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত।
১৩১৭

মূল্য চারি আনা।

মায়া-পুরী

—:•:—
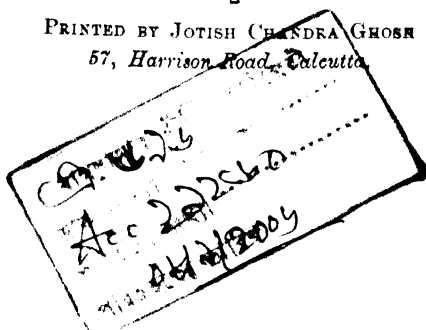
কেন জানি না, আমি এক মায়া-পুরী রচনা করিয়া আপনাকে সেই পুরীমধ্যে আবদ্ধ ভাবিয়া বসিয়া আছি ও আপনাকে সম্পূর্ণ পরতন্ত্র মনে করিয়া হা হতাশ করিতেছি। এই মায়া-পুরীর নাম বিশ্বজগৎ; আমি ইহার কল্পনা করিয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে ইহার অধীন ধরিয়া লইয়াছি। এই কাল্পনিক জগৎ আমারই একটা কিম্ভূতকিমাকার খেয়াল হইতে উৎপন্ন এবং এই কাল্পনিক জগতের অন্তর্গত যাবতীয় ঘটনা আমারই খেয়াল হইতে উদ্ভূত; আমি কিন্তু ঠিক উল্টা বুঝিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত করিয়া উহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ভাবিতেছি। এই বন্ধনের বৃত্তান্ত লইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্র; কিন্তু এই বন্ধন যখন কাল্পনিক বন্ধন, তখন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এইখানে গোড়ায় গলদ।

এই গোড়ায় গলদ স্বীকার করিয়া লইয়া আমি মানবজীবন আরম্ভ করি। বিশ্বজগতের একটা অংশকে আমি অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক করিয়া দেখি এবং তাহার নাম দিই আমার 'দেহ'। এই বিশ্বজগৎ অতি প্রকাণ্ড,—অনন্ত কি সান্ত, তাহা লইয়া এখানে বিতর্ক তুলিব না—কিন্তু এই প্রকাণ্ড জগতের যে অংশকে আমার দেহ বলি, উহা সমুদায়ের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র। যে চর্ম্মাবরণের মধ্যে আমার দেহখানি বর্ত্তমান, বস্তুতঃ সেইখানেই আমার দেহের সীমা, অথবা তাহা অতিক্রম করিয়া আর কিছু দূর পর্য্যন্ত দেহ বিস্তৃত আছে, জীববিদ্যা বা পদার্থবিদ্যা

এখনও তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না; কিন্তু আমরা মোটামুটি ঐখানেই উহার সীমানা ধরিয়া লই। এই সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ দেহটাকে আমরা নিতান্তই আপনার আত্মীয় ভাবি এবং ইহার বাহিরে বিশ্বজগতের যে বিশাল কায় বিদ্যমান, তাহাকে অনাত্মীয় বা পর ভাবি। দেহকে এত আত্মীয় ভাবি যে, সেকালের ও একালের বহু পণ্ডিত ও বহুতর মূর্খ—যাঁহাদের শাস্ত্রসম্মত উপাধি দেহাত্মবাদী—তাঁহারা এই দেহকেই সর্ব্বস্ব স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন ও আছেন। যিনি এই বিশ্বজগতের এবং বিশ্বজগতের অন্তর্গত এই দেহের কল্পনাকর্ত্তা ও রচনাকর্ত্তা, দ্রষ্টা ও সাক্ষী, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত না মানিতে ইঁহারা উদ্যত। সে কথা এখন থাক্। এই দেহ যাহা আমার আপন, ও বিশ্বজগতের অপরাংশ যাহা আমার পর, এই উভয়ের সম্পর্ক বড় বিচিত্র। বিশ্বজগতের এই অপরাংশকে বাহ্যজগৎ বলিব। এই দেহের সহিত বাহ্য-জগতের অনুক্ষণ কারবার চলিতেছে এবং এই কারবারের নামান্তর জীবন। এই কারবার যে ক্ষণে আরব্ধ হয়, সেই ক্ষণে জীবনধারী জীবের জন্ম এবং এই কারবার যে ক্ষণে সমাপ্ত হয়, সেই ক্ষণে তাহার মৃত্যু। জন্ম ও মৃত্যু, এই দুই ঘটনার মাঝে যে কাল, সেই কাল ব্যাপিয়া দেহের সহিত বাহ্যজগতের সম্পর্ক থাকে ও কারবার চলে। সে কিরূপ সম্পর্ক? প্রথমতঃ উহা বিরোধের সম্পর্ক। বাহ্যজগৎ দেহকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় আছে; সহস্র পথে সহস্র উপায়ে উহাকে নষ্ট করিয়া আপনার পাঞ্চভৌতিক উপাদানে লীন করিতে চাহিতেছে; শীতাতপ, রৌদ্র-বর্ষা, সাপ-বাঘ, মাষ্টার ও ডাক্তার, ম্যালেরিয়া প্লেগ ও বেরিবেরি, এই সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেহকে বিপন্ন নষ্ট ও লুপ্ত করিতে চাহিতেছে। ফলে বাহ্যজগৎই জীবদেহের পরম

বৈরী এবং একমাত্র বৈরী। কেন না, জীবের যত শত্রু আছে, সকলেই বাহ্জগৎ হইতে আসিতেছে। দেহের সহিত বাহ্জগতের আর একটা সম্পর্ক আছে, উহা মিত্রতার সম্পর্ক। কেন না, বাহ্জগৎ হইতে মশলা সংগ্রহ করিয়া দেহ আপনাকে গঠিত পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়াছে এবং বাহ্জগৎ হইতেই শক্তি সংগ্রহ করিয়া ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আপনাকে বাহ্জগতের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। বাহ্জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দেহের বাহ্জগৎ ভিন্ন অন্য অবলম্বন নাই। এই কারণে বাহ্জগৎ আমার পরম মিত্র এবং একমাত্র মিত্র। একমাত্র যে শত্রু, সেই আবার একমাত্র মিত্র, এই সম্পর্ক অতি বিচিত্র; কুত্রাপি ইহার তুলনা নাই। বাহ্জগতের মূর্ত্তি—এ কেমন হরগৌরী মূর্ত্তি ;—রুদ্রমূর্ত্তি হর আট প্রহর শিঙ্গা বাজাইয়া প্রলয়ের মুখে টানিতেছেন, আর বরাভয়করা গৌরী সেই প্রলয় হইতে রক্ষা করিতেছেন। বাহ্জগতের সহিত দেহের কারবার যুগপৎ এই দুই প্রণালীতে চলিতেছে; এই কারবারের নাম জীবন-দ্বন্দ্ব এবং জীবমাত্রেই অষ্টপ্রহর এই জীবন-দ্বন্দ্বে নিযুক্ত রহিয়াছে। দ্বন্দ্বের পরিণতিতে কিন্তু বাহ্জগতেরই জয়; জীবকে একদিন না একদিন পরাস্ত ও অভিভূত হইতে হয়; সেইদিন তাহার মৃত্যু।

জীব-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা হয় ত বলিবেন, জীবমাত্রেই মরিতে বাধ্য নহে; "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্" এই কবিবাক্য বিজ্ঞান-সম্মত নহে; কেন না, নিম্নশ্রেণিতে নামিয়া এমন জীব দেখা যায়, যাহারা বস্তুতই মরিতে বাধ্য নহে, যাহারা বস্তুতই অশ্বত্থামার মত চিরজীবী। বস্তুতঃ উচ্চতর শ্রেণির জীবেরাই মরণ-ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছে। উচ্চতর জীবেই মরণ-ধর্ম্ম উপার্জ্জন

করিয়াছে এবং তাহারাই বাহ্যজগতের সহিত বিরোধে পরাভূত হয় ও মরিয়া যায়, ইহা সত্য কথা। কিন্তু বাহ্যজগৎকে ফাঁকি দিবারও একটা কৌশল এই উচ্চতর জীবেরা উদ্ভাবন করিয়াছে। স্বভাবতঃ মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা পিতা অথবা মাতা সাজিয়া, অথবা যুগপৎ পিতা ও মাতা সাজিয়া, দেহের এক বা একাধিক খণ্ড বাহ্যজগতে নিক্ষেপ করে এবং সেই দেহখণ্ড আবার বাহ্যজগৎ হইতে মশলা ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পিতা মাতার মতই বাহ্য-জগতের সহিত লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই ব্যাপারের নাম বংশরক্ষা এবং জীব যখন মরিয়া যায়, সন্তান তখন তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া তাহারই মত জীবনদ্বন্দ্ব চালাইতে থাকে। বাহ্যজগতের একমাত্র লক্ষ্য—জীবনকে লোপ করা; জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—আপনাকে কোন না কোনরূপে বাহাল রাখা।

আধুনিক জীববিদ্যা জীবদেহকে যন্ত্র-হিসাবে দেখিতে চান। যন্ত্রমাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে। ঘটিকাযন্ত্র কাঁটা ঘুরাইয়া সময় নির্দ্দেশ করে। এঞ্জিন চাকা ঘুরাইয়া জল তোলে, ময়দা পেষে, গাড়ি টানে। যন্ত্রের মধ্যে যে সকল অবয়ব আছে,—যেমন ঘটিকাযন্ত্রের স্প্রিং পেণ্ডুলম চাকা কাঁটা ইত্যাদি—প্রত্যেক অবয়বের একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে; প্রত্যেক অবয়ব আপনার কার্য্য নিষ্পন্ন করিলে যন্ত্রটি আপনার উদ্দেশ্য-সাধনে সমর্থ হয়। দেহমধ্যেও সেইরূপ নানা অবয়ব আছে; নাক, কাণ, চোখ, হাত, পা, দাঁত এবং সকলের উপর উদর, প্রত্যেকে আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করিলে দেহযন্ত্র চলিতে থাকে। উদরের উপর অভিমান করিয়া কেহ কর্ম্মে শৈথিল্য করিতে গেলেই ঠকিয়া যায়। যন্ত্রকে চালাইতে হইলে বাহির হইতে শক্তি যোগাইতে হয়;—যেমন, ঘড়িতে দম দিতে হয়; এঞ্জিনে

কয়লার খোরাক যোগাইতে হয়,—দেহযন্ত্রেও তেমনই বাহির হইতে শক্তি যোগাইতে হয়। পায়স-পিষ্টক এবং মৎস্য-মাংস শক্তি বহন করিয়া দেহমধ্যে সঞ্চিত রাখে। সকল যন্ত্রেরই বিপত্তি আছে। বাহির হইতে চেষ্টা দ্বারা সেই বিপত্তি-নিবারণের উপায় করিতে হয়। ঘড়ির চাকায় মরিচা ধরিলে তেল দিতে হয়, স্প্রিং ছিঁড়িলে বদলাইয়া দিতে হয়; সেইরূপ দেহযন্ত্রেও বিপত্তিনিবারণের জন্য ঔষধ-প্রয়োগের ও অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হয়; ডাক্তার ও সার্জ্জন এখানে ছুতারের ও কামারের কাজ করেন। যে সকল যন্ত্রে কারিকরি অধিক, সেখানে যন্ত্রের মধ্যেই এমনি বন্দোবস্ত থাকে যে, বৈকল্য ঘটিবার আশঙ্কা হইলেই যন্ত্র আপনা হইতে আপনাকে সংশোধন করিয়া সামলাইয়া লয়। যেমন এঞ্জিনের ভিতর গবর্ণার থাকে; চাকার বেগ অনুচিত পরিমাণে বাড়িবার বা কমিবার উপক্রম হইলে উহা বাড়িতে বা কমিতে দেয় না। ষ্টীমের চাপ মাত্রা ছাড়িয়া বাড়িতে গেলে, "ছাড়-কপাট" অর্থাৎ safety valve আপনা হইতে খুলিয়া গিয়া খানিকটা ষ্টীম বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে আপনা হইতে আপনাকে সংশোধন করিয়া লইবার কৌশল দেহযন্ত্রমধ্যে এত অধিক আছে যে, যন্ত্রনির্ম্মাতার কারিকরিতে বিস্মিত হইতে হয়। দেহযন্ত্রের কোন অংশে বৈকল্য ঘটিলেই দেহযন্ত্র তাহা সংশোধনের চেষ্টা করে, আপনাকেই আপনি মেরামত করিয়া লয়; কামারের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। কর্ম্মকার ডাক্তার আসিয়া অনেক সময় হিতে বিপরীত ঘটান। ভাঙ্গা হাড় আপনা-আপনি জোড়া লাগে; আণ্টিভেনীন ব্যতিরেকেও সাপেকাটা মানুষ অনেক সময় মাথা তুলিয়া উঠে; দেহমধ্যে দুষ্ট জীবাণু প্রবেশ করিলে লক্ষ শ্বেতকণিকা রক্তস্রোতে ভাসিয়া গিয়া সেই জীবাণুকে ধ্বংস

করিতে প্রবৃত্ত হয়, এমন কি, নিজেই ঔষধ তৈয়ার করিয়া সেই দুষ্ট জীবাণুর উদ্গীর্ণ বিষের নাশ করে।

এই সকল কারণে জীবদেহকে যন্ত্র হিসাবে দেখা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই যন্ত্রের উদ্দেশ্য কি? ঘড়ির উদ্দেশ্য সময়-নিরূপণ। এঞ্জিনের উদ্দেশ্য ময়দা-পেষা,—ময়দাভোজীর পক্ষে অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু জীবদেহের জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য কি? জীব যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন আহার করে ও নিদ্রা যায় এবং সময়ে সময়ে লম্ফ ঝম্প করে। কিন্তু তাহার জীবনব্যাপী যাবতীয় কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবন-রক্ষা। তাহারা জীবনযাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনযাত্রা। গরুকে আমরা নিতান্তই জোর করিয়া লাঙ্গলে ও গাড়িতে খাটাইয়া লই; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে সেই গরু লাঙ্গল ও গাড়ি টানিবার জন্যই গোজন্ম গ্রহণ করে নাই। সময় মত ঘাস খাইয়া, রোমন্থন করিয়া, ঘুমাইয়া, শিং নাড়িয়া, লাফাইয়া এবং কতিপয় বৎসতরীর জন্মদান দ্বারা আপনার গোজন্মের ধারারক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, জীবলীলা সাঙ্গ করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অকস্মাৎ বাঘের সম্মুখে পড়িলে, তাহার উদ্দেশ্য সহসা ব্যর্থ হইয়া যায় বটে, কিন্তু সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার জীবন-ধারণের মহত্তর উদ্দেশ্য দেখা যায় না। মনুষ্য-নির্ম্মিত যে সকল যন্ত্র কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে না, যাহা কেবল নাচে বা লাফায় বা ঘুরিয়া বেড়ায় বা প্যাঁক প্যাঁক করে, তাহা যন্ত্রের মধ্যে নিম্নশ্রেণির যন্ত্র; তাহা বালকের কৌতুকের জন্য ক্রীড়নক রূপে ব্যবহৃত হয়। সেইরূপ জীবের দেহযন্ত্র, যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য খাইয়া শুইয়া লাফাইয়া চেঁচাইয়া কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত থাকা, তাহাও এই হিসাবে একটা প্রকাণ্ড কৌতুক বলিয়াই

বোধ হয়। যিনি এই দেহযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন, তাঁহার অন্তরে যদি কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য থাকে, তাহা আমরা অবগত নহি। অন্ততঃ জীববিদ্যা তাহা অবগত নহে।

ফলে জীববিজ্ঞান দেহযন্ত্রকে এইরূপ একটা কৌতুকের সামগ্রী বলিয়াই দেখে। কৌতুক হইলেও দেহের সহিত মানব-নির্ম্মিত অন্য যন্ত্রের কয়েকটা বিষয়ে পার্থক্য আছে। অন্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইলে কারিকরের অপেক্ষা করিতে হয়। সন্ধ্যার সময় খানিকটা কাঁচ আর রূপা আর পিতল আর লোহা টেবিলের উপর রাখিয়া দিলাম,—প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম, ম্যাকেবের ঘড়ির মত একটা ঘড়ি আপনা হইতে তৈয়ার হইয়াছে,—এরূপ ঘটনা দেখা যায় না। কিন্তু জীবদেহ আপনাকে আপনি গড়িয়া তোলে। কোনও কারিকরের জন্ম অপেক্ষা করে না। অবশ্য একবারে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু ক্ষুদ্র একটু বীজ, যাহার মধ্যে কোনও অবয়বই খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর, সে আপনা-আপনি বাতাস হইতে মাটি হইতে জল হইতে মশলা সংগ্রহ করিয়া আপনার সমস্ত অবয়ব গঠন করিয়া ডাল-পালা পত্র-পুষ্প নির্ম্মাণ করিয়া বৃহৎ বটবৃক্ষে পরিণত হয়। জীবন-হীন জড়-পদার্থেরও চতুঃপার্শ্ব মশলা বাছিয়া লইয়া আপনাকে বিচিত্র আকারে গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা দেখা যায় বটে। যেমন মৃৎকণিকার পরে মৃৎকণিকা জমিয়া, মাটির স্তরের উপর স্তর জমিয়া, স্তরের চাপে স্তর জমাট বাঁধিয়া, পাহাড়-পর্ব্বতের দেহ গঠিত হয়; অথবা চিনির দানা চিনির সরবত হইতে অনাবশ্যক জল বর্জ্জন করিয়া কেবল চিনির কণিকা স দ্বারা বৃহদাকার মিছরিখণ্ডে পরিণত হয়। কিন্তু জীবদে

পুষ্টিতে ও পরিণতিতে এবং জড়দেহের পুষ্টিতে ও পরিণতিতে একটা পার্থক্য আছে। মাটির স্তর মাটি সংগ্রহ করিয়া বাড়ে, আর মিছরির দানা চিনি সংগ্রহ করিয়া বাড়ে, এমন কি, বিচিত্র আকার পর্য্যন্ত ধারণ করে; কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কোনরূপ লড়াইয়ের বন্দোবস্ত করে না। মহাকায় হিমাচল হইতে ক্ষুদ্র মিছরির দানা পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা বিষয়ে একবারে উদাসীন। বায়ু জল ও তুষার, হিম ও রৌদ্র, হিমালয়ের মাথা ফাটাইয়া ও বুক চিরিয়া পর্ব্বতরাজকে জীর্ণ বিদীর্ণ ও চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে; কিন্তু পর্ব্বতরাজ একবারে উদাসীন; ইহা নিবারণের জন্য তাঁহার কোন চেষ্টাই নাই। কালক্রমে তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর ধূলি-কণায় পরিণত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে, তাহা নিবারণে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। মিছরির দানার পক্ষেও তাহাই; তাহাকে খলে ফেলিয়া চূর্ণ কর, আর জিহ্বায় দিয়া গলিত কর, আত্মরক্ষার জন্য তাহার কোন ব্যবস্থা নাই। বাহিরের জগৎ হইতে শক্তিপ্রবাহ আসিয়া বৃহৎ হিমাচলকে ও ক্ষুদ্র মিছরিখণ্ডকে আঘাত করিতেছে; সেই আঘাতে তাঁহারা নড়িতেছেন, কাঁপিতেছেন, গলিতেছেন। ইহাকে যদি সাড়া দেওয়া বলা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক আঘাতেই তাঁহারা সাড়া দেন। কিন্তু জীবদেহ যেভাবে বাহ্যজগতের আক্রমণে সাড়া দেয়, সেরূপ ভাবে উহারা সাড়া দেয় না। জীবদেহও আঘাত লাগিলে নড়ে, কাঁপে, চঞ্চল হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সেই আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। অনেক সময় তাহার সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আত্মরক্ষার চেষ্টা। আক্রমণ করিলে ছাগশিশু পলাইয়া যায়, সাপে ফণা তুলিয়া ছোঁ দেয়, ক্ষুদ্র পিপীলিকা কামড় দেয় এবং জলৌকা আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া সাধ্যমত আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।

জন্তুর মধ্যে, এমন কি, উদ্ভিদের মধ্যে এবং যাহা না-জন্তু না-উদ্ভিদ্, জীবসমাজে অতি নিম্নস্থানে যাহাদের স্থান, তাহাদের মধ্যেও, এই আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রত্যেক জীব আপনার অবয়বগুলিকে এরূপে গড়িয়া লইয়াছে, যাহাতে সে বাহ্যজগতের সহিত বিরোধে সমর্থ হয়, যাহাতে বাহ্যজগতের সহস্রাবধ আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। জীবের যাবতীয় চেষ্টাই তাহার আত্মরক্ষার অনুকূল; জড়যন্ত্রে আমরা এই চেষ্টা দেখিতে পাই না। যন্ত্রনির্মাতা কারিকর তাহাতে যে কয়টা অবয়ব দিয়াছেন এবং সেই অবয়ব-গুলিকে যে কার্য্যসাধনের উপযোগী করিয়াছেন, জড়যন্ত্র কেবল সেই কয়টি অবয়ব লইয়া সেই কয়টি কার্য্য সাধন করে মাত্র। ইহা অতিক্রম করিয়া এক পা চলিবার তাহার ক্ষমতা নাই। দেহযন্ত্রের বিধান এ স্থলে অসাধারণ। এইখানে একটা পার্থক্য। মনস্বী অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে দেখাইয়াছেন যে, জীব ও জড় উভয়েই বাহ্য শক্তির আঘাত পাইলে সাড়া দেয় এবং সেই সাড়া দিবার প্রণালীও উভয় পক্ষে একই প্রকার। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে জীবদেহের সাড়া দিবার ক্ষমতা যেমন লোপ পায়, জড় দেহেরও এইরূপ সাড়া দিবার ক্ষমতা লোপ পায়। সাড়া দিবার ক্ষমতাকে যদি জীবনের লক্ষণ বলা যায়, তাহা হইলে জড় দ্রব্যেরও জীবন আছে এবং সেই জীবনের সমাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও আছে। এপর্য্যন্ত আপত্তি চলিবে না। কিন্তু জীবের সাড়া দিবার চেষ্টা যেমন সর্ব্বতোভাবে তাহার জীবনরক্ষার অনুকূল, জড়ের চেষ্টা সেরূপ কোনও উদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহা বলিতে গেলে বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে।

পারিপার্শ্বিক শক্তির আঘাতে ও আক্রমণে আপনাকে পরিণত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার এই ক্ষমতা জীবদেহে বর্ত্তমান। জীবদেহের আর একটা ক্ষমতা আছে, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি—সেটা সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা। পারিপার্শ্বিক সরবত হইতে জল বর্জ্জন করিয়া চিনি বাছিয়া লইবার ক্ষমতা মিছরির দানার আছে; যেমন যব-গম শাক-পাতা হইতে রক্ত-মাংসের উপাদান নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা জন্তুদেহে রহিয়াছে। মিছরির দানা খণ্ডিত করিলে সেই বিচ্ছিন্ন মিছরিখণ্ড নূতন করিয়া মিছরি-জীবন আরম্ভ করিতে পারে। চারুপাঠোক্ত পুরুভুজ আপনাকে খণ্ডিত করে ও সেই নূতন পুরুভুজও নূতন করিয়া পুরুভুজ-জীবন আরম্ভ করিয়া থাকে। উচ্চতর জীবও আপনার কিয়দংশ বীজরূপে নিক্ষিপ্ত করিলে, সেই বীজ নবজীবন আরম্ভ করিয়া থাকে। জীবে ও জীবনহীন জড়ে এই সাদৃশ্যের আবিষ্কার চলিতে পারে। কিন্তু এই বীজের নবজীবন আরম্ভের একটা উদ্দেশ্য আছে। পিতামাতা যেখানে মরণধর্ম্মশীল, বীজ সেখানে নবজীবন আরম্ভ করিয়া পিতামাতার জীবনের প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ও সন্তত রাখে—জীবন-প্রবাহকে রুদ্ধ হইতে দেয় না। সন্তানোৎপত্তির একটা উদ্দেশ্য আছে; ব্যক্তি যায়, কিন্তু জাতি থাকে। ব্যক্তি যে সকল ধর্ম্ম লইয়া বাহ্যজগতের সহিত লড়াই করিতেছিল, তাহার বংশপরম্পরা সেই সকল ধর্ম্ম উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া জীবনের স্রোত থামিতে দেয় না। মিছরির খণ্ডে এই ক্ষমতা আছে বলিলে, মিছরি-খণ্ড মিছরি-বংশ রক্ষার জন্য বংশবৃদ্ধি করিতে পারে বলিলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যুক্তি হইবে। ঘটিকাযন্ত্রের বাচ্চা হয় না; হইলে ঘড়ির দোকান অনাবশ্যক হইত।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পৃথিবীতে এককালে যে সকল জীব ছিল না, কালক্রমে তাহারা আবির্ভূত হইয়াছে; অথচ এই সকল অভিনব জীব সৃষ্টি করিবার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তাকে কোনরূপ কারখানা বসাইতে হয় নাই। প্রচুর প্রমাণ আছে যে, পৃথিবীতে এককালে মানুষ বা গরু-ভেড়া বা পাখী বা সাপ-ব্যাঙ্ এমন কি, মাছ পর্য্যন্ত ছিল না। কালক্রমে মাছের আবির্ভাব হইয়াছে। তারপর ক্রমশঃ ব্যাঙ্, টিকটিকি পাখী চতুষ্পদ ও দ্বিপদের আবির্ভাব হইয়াছে। এখন টিকটিকিই বা কত রকমের, পাখীই বা কত রকমের, পশুই বা কত রকমের এবং কালা ও ধলা এইরূপ জাতিভেদ করিলে মানুষই বা কত রকমের। এখন পৃথিবীটাই একটা প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা; এক পয়সা দর্শনী না দিয়া আমরা এই চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিয়াছি। এককালে জীবের অতি অল্পসংখ্যক জাতি ছিল, ক্রমশঃ এত অধিক-সংখ্যক জাতির আবির্ভাব কিরূপে হইয়াছে, বুঝিবার জন্য নানা পণ্ডিত নানারূপে চেষ্টা করিয়াছেন। ডারুইন যতটা সফল হইয়াছেন, ততটা আর কেহ হন নাই। ডারুইন দেখিতে পাইলেন, জীবদেহে, অন্ততঃ উচ্চশ্রেণির জীবদেহে, কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্ম বিদ্যমান। প্রথমতঃ, জীব খাইতে না পাইলে বাঁচে না। খাইতে পাইলেও একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সে মরিয়া যায়। এই মরণ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিলেও সন্তান জন্মাইয়া বংশরক্ষা করিবার চেষ্টা করে। উহা আত্মরক্ষারই অর্থাৎ মৃত্যুকে ফাঁকি দিবারই এক প্রকারভেদ। সন্তান স্বভাবতঃ পিতামাতারই যাবতীয় ধর্ম্ম উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অবস্থাভেদে আপনাকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। একই পিতামাতার পাঁচটা সন্তান পাঁচরকমের

হয়, সর্ব্বতোভাবে এক রকমের হয় না। পাঁচটা সন্তানই জন্ম-লাভের পর বাহ্যজগতের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সকলের সামর্থ্য ঠিক্ সমান হয় না; কাহারও একটু অধিক, কাহারও বা একটু অল্প থাকে। এই বাহ্যজগতের সহিত সংগ্রাম কি ভীষণ, ডারুইনের পূর্ব্বে তাহা কেহ স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। শীতাতপ, রৌদ্রবর্ষা, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, এ সকলত আছেই; কিন্তু সংগ্রামের ভীষণতা মুখ্যতঃ অন্নের চেষ্টায়। বোধোদয়ে পড়া গিয়াছিল, ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। কথাটা ঠিক সন্দেহ নাই, কিন্তু ধরাধাম নামক চিড়িয়াখানার মালিক সহস্রকোটি জীবকে এই চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা পরস্পরকে ভক্ষণ কর, আমি তোমাদের অন্ন-সংগ্রহের জন্য এক পয়সা ঘরের কড়ি খরচ করিতে প্রস্তুত নহি; কিন্তু তোমরা যদি পরস্পরকে ধরিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে কাহারও অন্নাভাবে কষ্ট হইবে না; অতএব পরমানন্দে পরস্পরকে ভোজন কর। আহারদানের ও রক্ষা-কর্ম্মের ইহা অতি উত্তম বন্দোবস্ত, সন্দেহ নাই। অতঃপর সেই পরমকারুণিক মালিকের অনুমতিক্রমে গরু ঘাস খাইতেছে, বাঘে গরু খাইতেছে, ঘাস ধানগাছের অন্নে ভাগ বসাইয়া ধানগাছের সংহার করিতেছে; আর ধানের অভাবে দুর্ভিক্ষহত মনুষ্য বসুন্ধরার ক্রোড়ে জীর্ণ কঙ্কাল ন্যস্ত করিয়া কৃমিকীটের ও শৃগালকুকুরের ও বায়স-গৃধ্রের অন্নসংস্থান করিয়া দিতেছে। অতি উত্তম বন্দোবস্ত, সন্দেহ নাই। এই ভীষণ জীবনযুদ্ধে যাহার সামর্থ্য আছে, পটুতা আছে, সেই ব্যক্তিই কায়ক্লেশে জিতিয়া যায় ও বংশরক্ষার অবসর পায়। যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা অপটু, তাহারা বংশরক্ষায় সমর্থ হয় না। কে কিসে

জয়লাভ করে, বলা কঠিন। কেহ ধারাল দাঁতের জোরে, কেহ জোরাল শিঙের বলে, কেহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বলে, জয়লাভ করে। কেহ সম্মুখযুদ্ধে সামর্থ্য দেখাইয়া জিতিয়া যায়—তাহার বংশপরম্পরার শেষ পরিণতি সিংহ ও শার্দ্দুল। কেহ বা রণে ভঙ্গ দিয়া "যঃ পলায়তে স জীবতি" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করে—তাহার বংশধর শশক ও হরিণ।

ফলে জীবসমাজে একটা অবিরাম বাছাই কার্য্য চলিতেছে। পণ্ডিতেরা ইহার নাম দিয়াছেন—প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। জীবন-সংগ্রামে যাহাদের কোন না কোনরূপ পটুতা আছে, তাহাদিগকেই বাছাই করিয়া লওয়া হয়। যাহাদের পটুতা নাই, তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে মারিয়া ফেলা হয়। এই বাছাই কার্য্য যে নিতান্ত অপক্ষপাতে ও বিবেচনাসহকারে নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা নহে। অনেকে পটুতা সত্ত্বেও সামান্য ত্রুটিতে মারা পড়ে; অনেকে অপটু হইয়াও ফাঁকি দিয়া বাঁচিয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রকৃতি ঠাকুরাণীর নিকট হারি মানেন। তবে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই বাছাই কার্য্য অবিরাম গতিতে চলিতেছে; কাজেই মোটের উপর যাহারা কোন না কোন কারণে বাহ্যজগতের সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত সমর্থ ও দক্ষ, তাহারাই বাঁচিয়া গিয়াছে। যাহার যে অবয়ব এই পক্ষে অনুকূল, তাহার সেই অবয়ব পুরুষানুক্রমে গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে। যাহার যে ক্ষমতা এই পক্ষে অনুকূল, তাহার সেই ক্ষমতা পুরুষানুক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

জীবের দেহযন্ত্রের অন্তর্গত অবয়বগুলিতে জীবনরক্ষার অনুকূল নানা কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালের জীববিদ্যা-

বিশারদেরা এই কৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। নাক কাণ প্রভৃতি যে কোন একটা অবয়বের মধ্যে কত কারিকরি, কত কৌশল। আবার যে জীবের পক্ষে যেমনটি আবশ্যক, তাহার পক্ষে তেমনই বিধান। অসম্পূর্ণতা আছে সন্দেহ নাই; অসম্পূর্ণতা না থাকিলে জীবের আধিব্যাধি শোকতাপ হইবে কেন? তৎসত্ত্বেও এত গঠন-কৌশল দেখা যায়,—জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যে জীবনরক্ষা, সেই জীবনরক্ষার অনুকূল এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীববিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা এককালে এই সকল কৌশলের আলোচনায় রোমাঞ্চিত হইতেন এবং এই যন্ত্রের নির্ম্মাণকর্ত্তার স্তুতিগানে নাগরাজের মত সহস্রকণ্ঠ হইয়া পড়িতেন। ডারুইনের পর আমরা দেখিতেছি, জীবদেহের নির্ম্মাণ-কর্ত্তাকে কোনরূপ কারখানা খুলিতে হয় নাই। মাথা খাটাইয়া কোনরূপ নক্সা বা ডিজাইন প্রস্তুত করিতে হয় নাই। অথচ তিনি এমনই একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, জীবদেহ আপনা হইতে আপনাকে সহস্র বিভিন্ন উপায়ে গঠিত ও পরিণত করিয়া লইয়াছে। জীবদেহের যে কয়েকটি শক্তি গোড়ায় মানিয়া লওয়া গিয়াছে, সে শক্তি কয়টা থাকিলে এরূপ হবেই ত! বাঘের মধ্যে যে দন্তহীন, চিলের মধ্যে যে দৃষ্টিহীন, হরিণের মধ্যে যে পলায়নে অক্ষম, প্রজাপতির মধ্যে যে প্রজাপতি বিচিত্রবর্ণ ফুলের উপর আপনার বিচিত্রবর্ণ ডানা প্রসার করিয়া ফুলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আপনাকে গুপ্ত করিয়া শত্রুর মুখে ছাই দিতে পারে না, ফুলের মধ্যে যে ফুল মধুর প্রলোভনে, রঙের আকর্ষণে, গন্ধের প্ররোচনায় প্রজাপতিকে আকর্ষণ করিয়া তাহা দ্বারা আপনার পরাগ-রেণু পুষ্পান্তরে বহন করাইয়া বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না, জীবনসংগ্রামে তাহার জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা নাই;

সে বংশ রাখিবার অবকাশ পায় না। যাহাদের ঐ ঐ গুণ আছে, তাহারাই মোটের উপর বাঁচিয়া থাকে ও বংশ রাখে। তাহাদেরই বংশধরের দেহের গঠনে আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক ঐ সকল কৌশল দেখিয়া আমাদের অতিমাত্র বিস্মিত হইবার সম্যক্ হেতু নাই।

আত্মরক্ষা করিতে হইলে যাহা হেয় অর্থাৎ জীবন-সমরে যাহা প্রতিকূল, তাহাকে কোনরূপে বর্জ্জন করিতেই হইবে। যাহা উপাদেয় অর্থাৎ জীবন-সমরে অনুকূল, তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। জীবমাত্রেরই এই চেষ্টা, অন্ততঃ উন্নতশ্রেণির জীব-মাত্রেরই,–যাহারা প্রকৃতির হাতে কেবলমাত্র ক্রীড়ার পুতুল নহে, সেই উন্নত জীবমাত্রেরই—এই চেষ্টা থাকিবে। নতুবা সে সমরে পরাভূত হইবে, তাহার বংশ থাকিবে না। এই সকল জীবের মধ্যে যাহারা আবার আরও উচ্চশ্রেণিতে রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই হেয়-বর্জ্জন ও উপাদেয়-গ্রহণের জন্য একটা অতি অদ্ভুত কৌশলের আবির্ভাব দেখা যায়। এই শ্রেণির জীব উপাদেয়-গ্রহণে সুখ পায়, আর হেয়-বর্জ্জন করিতে না পারিলে দুঃখ পায়। জীবমধ্যে এই সুখদুঃখের আবির্ভাব কবে কোথায় কিরূপে হইল, এ একটা বিষম সমস্যা। বুদ্ধিজীবী মানুষ হয় ত এমন একটা ঘটিকাযন্ত্র তৈয়ার করিতে পারে যে সেও হেয়-বর্জ্জনে ও উপাদেয়-গ্রহণে সমর্থ হইবে। এমন ঘড়ি তৈয়ার করা চলিতে পারে, যে কোন দুষ্ট ব্যক্তি তাহার পেণ্ডুলমে হাত দিতে গেলে অমনি একটা দাঁতাল চাকা বাহির হইয়া হাতে কামড়াইয়া ধরিবে অথবা দম ফুরাইয়া গেলে, সেই ঘটিকাযন্ত্র একটা লম্বা হাত বাড়াইয়া দিয়া সূর্য্য-রশ্মি আকর্ষণ করিয়া সেই সূর্য্যরশ্মির উত্তাপে আপনার দম আপনি দিয়া লইবে। প্রথমটা হইবে হেয়-বর্জ্জন, দ্বিতীয়টা

হইবে উপাদেয়-গ্রহণ। কিন্তু এই কার্য্যে সমর্থ হইলে ঘটিকাযন্ত্র সুখী, আর অসমর্থ হইলে দুঃখী হইতে পারিবে, এ কথা বলিতে সাহস করি না। ঘটিকা-যন্ত্র সুখদুঃখ অনুভবে অসমর্থ। সকল জীবই যে সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে, তাহাও জোর করিয়া বলা চলে না; অণুবীক্ষণে যে সকল ক্ষুদ্র জীবাণু দেখা যায়, তাহাদের কথা দূরে আস্তাম্, কেঁচো কিম্বা জোঁকের মত অপেক্ষাকৃত উন্নত জীব, যাহারা অহরহঃ আত্মরক্ষার জন্য হেয়-বর্জ্জন করিতেছে ও আত্মপুষ্টির জন্য উপাদেয় গ্রহণ করিতেছে, তাহারাও সুখদুঃখ অনুভবে সমর্থ কি না, বলা কঠিন। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আসিয়া তর্ক তুলিবেন, কেঁচো জোঁক দূরে থাক, আপনি,—যিনি সর্ব্বতোভাবে আমারই মত মনুষ্যধর্ম্মা জীব, আপনারই যে সুখদুঃখের অনুভব-ক্ষমতা আছে, তাহার প্রমাণ কি? আপনাকে হাসিতে দেখি ও কাঁদিতে দেখি এবং উভয় স্থলেই আপনার মুখভঙ্গী ও দন্তবিকাশ ও চীৎকারের প্রণালী দেখিয়া আমি অনুমান করিয়া লই, আপনি আমারই মত হাসির সময় সুখভোগ করেন ও কান্নার সময় দুঃখভোগ করেন। কিন্তু উহা আমার অনুমানমাত্র; আপনার সুখদুঃখের অনুভব কস্মিন্ কালে কস্মিন্ উপায়ে আমার প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। আমি নিজের সুখদুঃখ প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুভব করিতে পারি; অন্যের সুখদুঃখ আমার কাছে কেবল তাঁহার মুখভঙ্গী ও দন্তবিকাশের অতিরিক্ত কিছুই নহে। সে কথা থাক্। যখন জ্ঞানগোচর জগতের এক আনা আমার প্রত্যক্ষগোচর, বাকি পনের আনার জন্য আমাকে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়, তখন স্বীকার করিয়া লইলাম, মহাশয়ও আমারই মত সুখানুভবে ও দুঃখানুভবে সমর্থ। মহাশয় যখন সমর্থ, তখন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ হনুমানও সমর্থ ছিলেন এবং

গরু-ভেড়া, চিল-শকুনি, টিক্‌টিকি-গিরিগিটি, মাছি-মশা পর্য্যন্তও না হয় সুখদুঃখ-বোধে সমর্থ, ইহা স্বীকার করিয়া লইলাম।

জীবের এই সুখদুঃখের অনুভব-ক্ষমতা কিরূপে পুষ্ট হইল, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ডারুইন-শিষ্যেরা বড় কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। এই অনুভবে জীবের লাভ আছে কি না, তাঁহারা কেবল ইহাই দেখিবেন। যদি এই অনুভব-ক্ষমতা জীবন-দ্বন্দ্বে কোনরূপ সাহায্য করে, তাহা হইলে উহার আবির্ভাবের জন্য ডারুইন-শিষ্য চিন্তিত হইবেন না। বলা বাহুল্য যে, অনুভবশক্তি-হীন জীব অপেক্ষা অনুভবশক্তি-যুক্ত জীবের জীবন-সংগ্রামে জয়ের সুযোগ অত্যন্ত অধিক। এত অধিক যে, সুখদুঃখভাগী জীবের সহিত ইতর জীবের এ বিষয়ে তুলনাই হয় না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে উন্নত জীবের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, মোটের উপর উপাদেয়-গ্রহণেই তাহার সুখ ও হেয়-বর্জ্জন করিতে না পারিলেই তাহার দুঃখ। যদি কোন দুর্ভাগ্য জীব হেয়-গ্রহণে সুখ পায় বা উপাদেয়-বর্জ্জনে আনন্দ অনুভব করে, পতঙ্গের মত আগুন দেখিলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায় অথবা অন্নদর্শনে বমন করে, ধরা-ধামে তাহার স্থান হইবে না; বংশরক্ষাতেও তাহার অবসর ঘটিবে না।

যে বাহ্যজগতের সহিত জীবের যুগপৎ মিত্রতা ও শত্রুতা, সেই বাহ্যজগতের কিয়দংশ সে সুখজনক ও কিয়দংশ দুঃখজনক রূপে দেখিয়া থাকে। মানুষের কথাই ধরা যাক। মানুষ দেহমধ্যে পাঁচ পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের দরজা খুলিয়া বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থানে বসিয়া আছে। চারিদিক্ হইতে জাগতিক শক্তিসমূহ তাহার সেই ইন্দ্রিয়দ্বারে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে। সেই আঘাতপরম্পরা গোটাকতক তার বাহিয়া মাথার ভিতর প্রবেশ

করিলে মাথার মগজ কিলবিল করিয়া উঠে। মনুষ্যদেহ যন্ত্রমাত্র; বাহ্য-শক্তির উত্তেজনায় সেই যন্ত্র সাড়া দেয়। কিন্তু আমার মাথার খুলির ভিতরে যে এমন কাণ্ড হইতেছে, আমি তাহার কিছুই জানিতে পারি না। ঐ সকল জাগতিক শক্তির সহিত, ঐ সকল আঘাতপরম্পরার সহিত আমার মুখ্যতঃ কোনও সম্পর্ক নাই। আমার সহিত মুখ্য সম্পর্ক কয়েকটা অনুভূতির; পাঁচটা ইন্দ্রিয়ে আঘাত করিলে পাঁচ রকমের অনুভূতি জন্মে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। মাথার খুলির ভিতর কিলবিলের কথা আমি কিছুই জানি না; আমি জানি কেবল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। এই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের সহিত আমার মুখ্য সম্পর্ক, অথবা একমাত্র সম্পর্ক। কেন না আমার পক্ষে জগৎ, যে জগৎকে আমি জানি, সেই জগৎ রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময়। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শহীন জগৎ যদি থাকে, তাহা আমার জ্ঞানগোচর নহে। এই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ যে আমি অনুভব করিতেছি, ইহাই আমার জ্ঞান; আমি ইহাই জানি, বাহ্যজগৎ সম্পর্কে আর কিছু জানি না। জীবনহীন যন্ত্রের এই বোধ নাই। ঘটিকাযন্ত্র বা এঞ্জিনযন্ত্র রূপ রস সম্বন্ধে বোধহীন; অতএব বাহ্যজগৎ সম্বন্ধেও সে একেবারে জ্ঞানহীন। আবার জীবন থাকিলেই যে এই জ্ঞান থাকিবে, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। কেঁচো কিংবা জোঁক বাহ্যজগতের উত্তেজনা পাইলে সাড়া দেয়,—জড়যন্ত্রে যেমন সাড়া দেয়, তার অপেক্ষা অনেক ভাল সাড়া দেয়,—কিন্তু বাহ্যজগৎসম্বন্ধে কেঁচোর বা জোঁকের কোনরূপ জ্ঞান আছে, ইহা খুব জোরের সহিত কেঁচো-তত্ত্ববিৎ বলিতে পারেন না। জীবজগতের খুব উচ্চ প্রকোষ্ঠে যাহাদের বাস, তাহাদেরই এই জ্ঞান আছে, আমরা অনুমানপূর্ব্বক বলিতে পারি।

ফলে উন্নত জীব বাহ্যজগৎকে জানে না ; সে জানে কেবল রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শকে। এই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের পরম্পরাই তাহার নিকট বাহ্যজগৎ। কোন রূপ, কোন রস, কোন গন্ধ, কোন শব্দ, কোন স্পর্শ জীবের সুখপ্রদ—তাহাই তাহার উপাদেয়, তাহাই গ্রহণের জন্য সে ব্যাকুল ; যাহা দুঃখপ্রদ, তাহাই তাহার হেয় ; তাহা বর্জ্জন করিতে সে ব্যস্ত। সে আর কিছু দেখে না। কোন্ অনুভবটা সুখ দেয়, কোন্‌টা দুঃখ দেয়, তাহাই দেখে ও তদনুসারে যাহা সুখজনক, তাহা গ্রহণ করে ও যাহা দুঃখজনক, তাহা বর্জ্জন করে। সৌভাগ্যক্রমে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে এরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, যাহা জীবনরক্ষার অনুকূল, তাহাই মোটের উপর আরাম দেয়, যাহা মোটের উপর প্রতিকূল, তাহাই দুঃখ দেয়। মোটের উপর বলিলাম, কেন না, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল কোথাও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই ; সর্ব্বত্রই খট্‌কা আছে ও অসম্পূর্ণতা আছে। অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়াই পতঙ্গ বহ্নিমুখে বিবিক্ষু হয়। অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়াই গাঁজা গুলি ও মদের দোকান চলিতেছে। জীবন-সমরে প্রতিকূল হইলেও মানুষের ঐ সকল দ্রব্যের প্রতি নেশা আছে,—উহা একরকমের আরাম দেয় ও ভ্রমক্রমে উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হয়। মানুষ-পতঙ্গ দেখিয়া শুনিয়াও সেই আরামের লোভে ঐ সকল বহ্নির মুখে প্রবেশ করিতে যায়। এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মোটের উপর যাহা জীবন-দ্বন্দ্বে অনুকূল, তাহাই সুখজনক বলিয়া উপাদেয়, ও যাহা প্রতিকূল, তাহা দুঃখজনক বলিয়া হেয়।

এই রূপ-রসাদির জ্ঞান এবং তৎসহিত সুখদুঃখের অনুভবের আবির্ভাব, উচ্চতর জীবকে জীবন-সমরে আশ্চর্য্যভাবে সমর্থ

করিয়াছে। আগুনে হাত দেওয়া জীবনের পক্ষে অনুকূল নহে; আমরা আগুন হইতে হাত সরাইয়া লই; আগুনের ভয়ে নহে, আগুন যে বেদনা দেয় তাহারই ভয়ে। এইরূপ সর্ব্বত্র। যাহা দুঃখজনক, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে দূরে যাই; যাহা সুখ-জনক, তাহাকে টানিয়া লই। পায়সান্ন দেখিলেই আমাদের লালা নিঃসরণ হয়, আর কটু ও তিক্তরস হইতে আমরা রসনা সংবরণ করি। এইরূপে আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। সময়ে সময়ে পতঙ্গ-বৃত্তির জন্য ঠকিতে হয় বটে। কিন্তু মোটের উপর জীবন-যাত্রার প্রণালী এই যে, সুখকে অন্বেষণ করিতে হইবে ও দুঃখকে পরিহার করিতে হইবে। এই শিক্ষা আমরা প্রকৃতিদেবীর পাঠশালায় লাভ করিয়াছি।

যাহাদের এই প্রবৃত্তি নাই, যাহারা লঙ্কা আর নিমের পাতা পেট ভরিয়া খায়, আর লুচিমণ্ডায় সঙ্কোচ বোধ করে, প্রকৃতিদেবী তাহাদের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলেন, তাহাদের ভিটা পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হয়; তাহাদের বংশে বাতি দিতে কেহ থাকে না। কাজেই যাহাদের সুখলাভের ও দুঃখ-পরিহারের প্রবৃত্তি আছে, তাহারাই প্রকৃতির পাঠশালা হইতে পাস করিয়া বাহিরে আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া লক্ষ পুরুষের গলা-টেপার পর জীবের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। মাষ্টার মহাশয় আমাদের কল্যাণের জন্য বেত মারেন, তাহাতে আমাদের ক্ষোভ হয়; কিন্তু এই নিষ্ঠুর লেডী মাষ্টার যে, মন্দ ছেলেদের একবারে গলা টিপিয়া দেন, তজ্জন্য আমরা ক্ষুব্ধ হই না।

জীবন-রক্ষার জন্য এই প্রবৃত্তিগুলার এত প্রয়োজন যে, প্রকৃতি-দেবী সেগুলার সম্বন্ধে আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে একবারেই তাকান নাই। তাঁহার নিষ্ঠুর আইনের প্রয়োগে একবারে কঠোর

বিধান বাঁধিয়া দিয়াছেন ;—ক্ষুধা লাগিলেই খাইতে হইবে, তৃষ্ণা হইলেই জলের অন্বেষণ করিতে হইবে, বাঘের মুখ হইতে পলাইতেই হইবে ; আগুন হইতে হাত গুটাইয়া লইতেই হইবে ; এ সকল বিষয়ে আমাদের ভাবিবার অবসর নাই, আমাদের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। এই সকল প্রবৃত্তির নাম সংস্কার। উচ্চতর জীব যখনই ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই এই সংস্কারগুলি লইয়া জন্মে,—পিতামাতার নিকট হইতে জন্ম-সহ এই সংস্কার প্রাপ্ত হয়। জন্ম-সহ প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাদের নাম দিতে পারি সহজাত বা সহজসংস্কার ; ইংরেজিতে বলে instinct। এই সকল সহজসংস্কার জীবকে জীবনপথে চালাইতেছে ; মোটের উপর, সুপথেই ; চালাইতেছে ; যে পথে গেলে জীবন রক্ষা হইবে, সেই পথেই চালাইতেছে। কাজেই সহজ-সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে থাকিলে, মোটের উপর জীবন-যাত্রা বেশ চলিয়া যায়। মোটের উপর,—কেন না, বাহ্জগৎ হইতে এমন সকল আক্রমণ আসে, সহজসংস্কারে সে স্থলে কোনরূপ কর্ত্তব্য উপদেশ দেয় না। জীবের জীবনে যে সকল আক্রমণ ও আঘাত অনুক্ষণ সদাসর্ব্বদা ঘটিতেছে, সেগুলার সম্বন্ধে সহজসংস্কারই প্রধান অবলম্বন। এখানে সংস্কারের বলেই কর্ত্তব্য নির্ণয় হয় ; ভাবিবার চিন্তিবার অবসর থাকে না। কিন্তু এমন অনেক ঘটনা ঘটে, রূপ-রস-গন্ধাদির এমন মিশ্রণ মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে জীব কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে ; তাহার সহজ সংস্কার তখন তাহাকে কোনও লক্ষ্য নির্দ্দেশ করে না। অনুক্ষণ এই সকল আক্রমণ ঘটে না বলিয়াই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই শ্রেণির আক্রমণ হইতে ঝটিতি পরিত্রাণের কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। কাজেই জীব এখানে কি করিবে, তাহা সহসা ঠাওর করিতে পারে না।

যে সকল আঘাত ও উত্তেজনা কখনও বা সুখ দেয়, কখনও বা দুঃখ দেয়, কখনও বা সুখদুঃখ কিছুই দেয় না, জীব সেই সকল স্থলে সুখলাভের বা দুঃখ-পরিহারের চেষ্টা করিতে গিয়া সময়ে সময়ে ঠকিয়া যায়; আপাততঃ সুখজনক বলিয়া যাহাকে গ্রহণ করে, ভবিষ্যতে ও পরিণামে তাহা হয় ত দুঃখ আনয়ন করে। জামের মত যদি আফিমের গুলি সুলভ হইত, তাহা হইলে অহিফেন-তৃষ্ণা দমনের জন্য প্রকৃতি দেবীই একটা ব্যবস্থা করিতেন; সুলভ নহে বলিয়াই মানুষ এখানে নেশার অধীন। সেইরূপ আপাততঃ দুঃখ মনে করিয়া যাহাকে পরিহার করে, তাহা পরিণামে হয় ত কল্যাণকর হইতে পারিত। সহজসংস্কারের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে এ সকল স্থলে পরিণামে মঙ্গল হয় না।

অদ্ভুতের উপর অদ্ভুত এই যে, এইরূপ স্থলেও কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি জীব একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। যেখানে সহজসংস্কার কোনও উপদেশ দেয় না, সেখানে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি আসিয়া গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়। এই বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তির ক্ষমতা অতি আশ্চর্য্য। উন্নত জীবের মধ্যে আবার যাহারা অত্যুন্নত প্রকোষ্ঠে বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যেই এই বৃত্তি ও এই ক্ষমতা স্পষ্ট দেখা যায়। মৌমাছি অতি অদ্ভুত ধরণের মৌচাক নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মধু সঞ্চয় করে। পিপীড়া আরও অদ্ভুত ধরণে সমাজ-পালনের ব্যবস্থা করে; কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক করে, ইহা বলা চলে না। উহারা সহজ সংস্কারের প্রভাবেই ঐ সকল কাণ্ড করিয়া থাকে। মৌমাছি যন্ত্রের মত পুরুষানুক্রমে তাহার চাক নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে; পিঁপীড়া যন্ত্রের মতই তাহার সমাজ বাঁধিয়া আসিতেছে; এ সকল কার্য্যে তাহারা সংস্কারবশে বাধ্য আছে অথবা প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত

আছে ; এ বিষয়ে তাহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা স্বাধীনতা কিছু নাই। কেন কি উদ্দেশ্যে তাহারা ঐরূপ করিতেছে, তাহা তাহারা জানে না। জীবন ধরিতে গেলে উহাদিগকে ঐরূপ করিতেই হইবে। না করিলে জীবন-যাত্রা চলে না বলিয়াই প্রকৃতিদেবী প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা উহাদিগকে ঐ প্রবৃত্তি ও ঐ ক্ষমতা দিয়াছেন। যাহাদের ঐ প্রবৃত্তি ছিল না বা ঐ ক্ষমতা ছিল না, তাহাদিগকে টিপিয়া মারিয়াছেন। উচ্চ পশু-পক্ষীর বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি আছে কি না, বলা বিষম সমস্যা। তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষার হাতী যখন তাহার মাহুতের মাথায় নারিকেল প্রহার করিয়াছিল, তখন সে যে বিচার-শক্তির পরিচয় দেয় নাই, তাহা বলা দুষ্কর। আমার কোন আত্মীয় মহাজনি-ব্যবসা করিতেন ; তাঁহার বাড়ীর দরজায় খাঁচার মধ্যে একটি ময়না পাখী ঝুলিত। কোন ব্যক্তি দরজার চৌকাঠে পা দিবামাত্র পাখী জিজ্ঞাসা করিত, "টাকা এনেছিস্ ?" পাখীর এই কর্ম্ম কতটুকু সংস্কার-প্রেরিত, আর কতটুকু বিচার-পূর্ব্বক কৃত, বলা কঠিন। কিন্তু বানর যখন তাহার পালকের আদেশক্রমে কদমগাছে উঠে, আর সাগর ডিঙ্গায় ও শ্বাশুড়ীকে ভেংচায়, তখন তাহার এই ব্যবহার যে বুদ্ধি-পূর্ব্বক আচরিত হয় না, ইহা বলা কঠিন। সে যাহাই হউক, জীবের মধ্যে মনুষ্য এই বৃত্তির পরাকাষ্ঠা পাইয়াছে। এই বৃত্তির উৎকর্ষহেতু মনুষ্য জীবজগতে শ্রেষ্ঠ।

এই বুদ্ধিবৃত্তি যে জীবন-রক্ষার পক্ষে অনুকূল, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই। কেন না, সহজ সংস্কার যেখানে পথ দেখায় না, অথচ ঠকাইয়া দেয়, বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে গন্তব্য নির্ণয় করিয়া জীবন-রক্ষার উপায় করে। বুদ্ধিজীবী মনুষ্যই সুরাপান-নিবারিণী

সভা স্থাপন করে এবং অমাবস্যার নিশিপালনে ব্যবস্থা দেয়। বুদ্ধিবৃত্তি জীবন-রক্ষার যখন অনুকূল, তখন ডারুইন-শিষ্যের আর ভাবনা নাই। তিনি অকুতোভয়ে বলিলেন, ঐ বুদ্ধিবৃত্তিও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে লব্ধ। হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। বুদ্ধিবৃত্তিও পুরুষ-পরম্পরায় সংক্রান্ত হইতেছে এবং সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে ইহার তীক্ষ্ণতা ও পরিসর ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু সহজাতসংস্কারের সহিত ইহার অত্যন্ত প্রভেদ। মানুষ পিতামাতার নিকট হইতেই এই বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়া থাকে; কিন্তু ইহার প্রয়োগ-নৈপুণ্য মানুষকে শিক্ষা দ্বারা লাভ করিতে হয়। মানুষ জন্মকালে যে বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করে, জন্মের পর শিক্ষার দ্বারা সেই বৃত্তির প্রয়োগ-প্রণালী শিখিয়া লয়। পিতামাতা যে অবস্থায় কখনও পড়েন নাই, যে অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, পুত্র সেই অবস্থায় পড়িলে কিরূপে চলিতে হইবে, বুদ্ধিবৃত্তি তাহা স্থির করিয়া দেয়। এমন কি, পিতামাতা কোনও অবস্থায় পড়িয়া বুদ্ধি-প্রভাবে যদি কোন পথ নির্ণয় করিয়া থাকেন, পুত্র জন্মমাত্রেই সেই পথ জানিতে পারে না। তাহাকে নূতন করিয়া তাহা শিখিয়া লইতে হয়। এই শিক্ষা মোটের উপর ঠেকিয়া শেখা। এখানে সুখ-দুঃখের উপর নির্ভর চলে না। বাহ্য-জগতের কোন আক্রমণ আমাকে একটা আঘাত দিয়া গেল, আমি তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলাম না; সহজসংস্কার এখানে পথ দেখাইয়া দেয় নাই; আমি ঠকিয়া গেলাম। কিন্তু এই যে ঠকিয়া গেলাম, এই ঘটনাটা আমার অভ্যন্তরে মুদ্রিত ও অঙ্কিত রহিল। পরবর্ত্তী আক্রমণের জন্য আমি প্রস্তুত থাকিলাম। সেবার আর আমি ঠকিলাম না। আমার বুদ্ধি-বৃত্তি আমাকে বলিয়া দিয়াছে,

এইরূপে এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। গ্রামে প্লেগ প্রবেশের পূর্ব্বে ইঁদুর মারিতে হইবে, মানুষের সহজসংস্কার তাহা বলে না; মানুষ ইহা ঠেকিয়া শিখিয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতা-ফলে এইরূপে আমি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হই। বাহ্যজগতের আক্রমণ নানা দিক্ হইতে নানা মূর্ত্তিতে আসিয়া আমাদিগকে নানারূপে ঘা দিতেছে ও ঠকাইতেছে। ক্রমশঃ আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছি; ভবিষ্যতের আক্রমণ যাহাতে বিপন্ন করিতে না পারে, তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছি। কি করিলে কি হয়, অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। আমরা সেই ধারণা সঞ্চয় করিতেছি ও আবশ্যকমত প্রয়োগ করিতেছি। কোন্ বস্তুর সহিত কোন্ বস্তুর কিরূপ সম্পর্ক, কোন্‌টা হিতকর, কোন্‌টা অহিতকর, কোন্‌টা আপাততঃ সুখদায়ক হইলেও হেয় বা দুঃখদায়ক হইলেও উপাদেয়, তাহার সমাচার আমাদের মধ্যে আমারা মুদ্রিত করিয়া রাখিতেছি। সেই অভিজ্ঞতার ফলে আমরা গন্তব্য পথ নিরূপণ করিতেছি। সহজাত পাশবিক সংস্কারের বশে যন্ত্রবৎ নীয়মান না হইয়া আমরা স্বাধীনভাবে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের জীবন-রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি। যে রূপ রস গন্ধ আসিয়া আমাদিগকে আঘাত দিতেছে, সেই রূপ রস গন্ধকেই আমরা স্বকার্য্য-সাধনে প্রেরণ করিতেছি। তাহাদিগকেই আমরা খাটাইয়া লইতেছি। তাহারা শত্রুভাবে আসিলেও তাহাদিগকে আমরা জীবন-রক্ষার অনুকূল করিয়া লইতেছি। ইহারই নাম বৈজ্ঞানিকতা। মনুষ্য এই জন্য বৈজ্ঞানিক জীব। বিশ্বজগতের মধ্যস্থলে আমি বসিয়া আছি এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে সহস্র সমাচার আমার ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রবেশ করিয়া আমার অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত করিতেছে। আমি

নিরীক্ষণ করিতেছি ; আমি সাক্ষী, আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা চিত্তপটে আঁকিয়া রাখিতেছি এবং প্রয়োজনমত তাহা আমার কাজে লাগাইতেছি। কাজ, কি না—জীবন-রক্ষা। রূপ-রসাদির প্রবাহ আসিয়া আমার চিত্তপটে রেখা টানিয়া যাইতেছে। তাহার সাহায্যে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেছি। অতএব আমি বৈজ্ঞানিক।

কিসে কি হইতেছে, কিসের পর কি ঘটিতেছে, কখন কি ঘটিতেছে, ইহা বসিয়া বসিয়া দেখা এবং এই দর্শনজাত অভিজ্ঞতাকে জীবন-যুদ্ধের কাজে লাগান, বৈজ্ঞানিকের এইমাত্র কার্য্য। মনে করিও না যে, বগলে থার্ম্মিটার ও চোখে দূরবীন না লাগাইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। ষ্টীম-এঞ্জিন আর ডাইনামো, আর মোটরগাড়ী আর গ্রামোফোন দেখিয়া ভুল বুঝিও না যে, যন্ত্র-তন্ত্রের বহ্বারম্ভ না হইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। বসিয়া বসিয়া জগৎযন্ত্রের গতিবিধির আলোচনা ও সেই আলোচনাকে আপন জীবনযাত্রায় নিয়োগ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক হয়। এই অর্থে আমরা সকলেই ছোট বড় বৈজ্ঞানিক। এমন কি, তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষার হাতী যে রাগ করিয়া মাহুতের মাথায় নারিকেল ভাঙ্গিয়াছিল, সেও যে একটা ছোটখাট বৈজ্ঞানিক ছিল না, তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারি না। আজ বড় বড় বৈজ্ঞানিকের হাতে, কেলবিনের হাতে, অথবা এডিসনের হাতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বা উদ্ভাবনার সংবাদ শুনিয়া ত্রস্ত হইবার হেতু নাই ; মানবের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি কোন্ অতীত কালে কোন্ অজ্ঞাতনামা বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার খবরও রাখে না। আমাদের যে অরণ্যবাসী পূর্ব্বপিতামহ সর্ব্বপ্রথমে কাঠে

কাঠে ঘষিয়া আগুন তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কোনও এডিসনের কোনও উদ্ভাবনা তাহার সহিত তুলনীয় নহে। তুমি, আমি, সে, প্রত্যেকেই এই বিশ্বজগতের দিকে চাহিয়া আছি ও যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছি, তাহাই আমাদের কাজে লাগাইতেছি। আমরা সকলেই বৈজ্ঞানিক; কেহ ছোট, কেহ বড়। প্রত্যেকেই আমরা কিছু না কিছু নূতন ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং এই আবিষ্কৃত ঘটনা-সমষ্টি পুঞ্জীভূত হইয়া ও পুরুষ-পরম্পরাক্রমে সঞ্চিত হইয়া মানবজাতির অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত করিতেছে।

আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বজগতের পর্য্যবেক্ষক। সকলের দৃষ্টি-শক্তি সমান নহে। কেহ উপর উপর দেখেন, কেহ তলাইয়া দেখেন। কাহারও দৃষ্টি স্থূল, কাহারও সূক্ষ্ম; কেহ দূরের বস্তু দেখেন, কাহারও দৃষ্টি সমীপদেশেই নিবদ্ধ। কেহ অত্যন্ত চক্ষুষ্মান্, কেহ বা চক্ষু সত্ত্বেও অন্ধের মত ব্যবহার করেন। কেহ আন্দাজে দূরত্ব নিরূপণ করেন, কেহ গজকাঠি হাতে লইয়া মাপিয়া দেখেন। কেহ সহজ চোখে তাকান, কেহ চোখের সম্মুখে চশমা ও পরকলা লাগাইয়া দেখেন। সহজ চোখে যাহা দেখা যায়, চোখের সামনে খানকতক কাচের পরকলা রাখিলে তার চেয়ে অধিক দেখা যায়; কাজেই যে বড় বৈজ্ঞানিক, সে দূরবীণ দিয়া দূরের জিনিষ দেখে বা অনুবীক্ষণ দিয়া ছোট জিনিষ বড় করিয়া দেখে। জগতে যাহা আপনা হইতে ঘটিতেছে, কেহ তাহাই দেখিয়া তুষ্ট; কেহ বা পাঁচটা ঘটনা ঘটাইয়া দেখিয়া তুষ্ট। পাঁচটা দ্রব্য পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পরস্পর ব্যবহার দেখিলে, তাহাদের দ্বারা পাঁচটা ঘটনা ঘটাইয়া দেখিলে, অনেক নূতন খবর পাওয়া যায়—যাহা কেবল স্বভাবের উপর

নির্ভর করিয়া থাকিলে পাওয়া যায় না। এইরূপ ঘটনা-ঘটানর নাম পরীক্ষা করা, ইংরেজিতে বলে experiment করা; আমরা সকলেই কিছু না কিছু experiment করিতেছি। বৈজ্ঞানিকতা যাঁহার ব্যবসায়, তাঁহাদের কেহ অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনে আগুন ধরাইয়া দেখিতেছেন, কি হয়; কেহ দস্তার উপর দ্রাবক ঢালিয়া দেখিতেছেন, কি হয়; কেহ চুম্বকের নিকট লৌহখণ্ড ধরিয়া দেখিতেছেন, কি হয়; কেহ ইন্দুরের লেজ কাটিয়া দেখিতেছেন, তাহার বাচ্ছার লেজ গজায় কিনা; কেহ রোগীকে কোন ঔষধ গেলাইয়া দেখিতেছেন, সে শীঘ্র ভবসংসার পার হয় কি না। এইরূপ ঘটনা ঘটাইয়া অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সুচারু ব্যবস্থা করায় সম্প্রতি মনুষ্যের অভিজ্ঞতা অতি-মাত্রায় বাড়িয়া চলিতেছে এবং এই রীতির অবলম্বন-হেতু বৈজ্ঞানিকতার মাহাত্ম্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফলে আমিও দেখি, তুমিও দেখ, আর লর্ড কেলবিনও দেখেন; কিন্তু তুমি আমি যাহা দেখি, লর্ড কেলবিন তাহার তুলনায় অনেক অধিক দেখেন, অনেক সূক্ষ্ম দেখেন, আন্দাজ না করিয়া মাপ করিয়া দেখেন এবং দেখিতে যাহাতে ভুল না হয়, তাহার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করেন; ইন্দ্রিয় যাহাতে প্রতারিত না করে, তাহার ব্যবস্থা করেন। আবার আমরা যাহা কাজে লাগাইতে পারি না, কেলবিন অবলীলাক্রমে তাহা কাজে লাগান। আমরা উভয়েই বৈজ্ঞানিক; কেহ অতি ছোট, কেহ অতি বড়।

বিশ্বজগতের ঘটনা-পরম্পরা বৈজ্ঞানিক বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন; কিন্তু উহা কেন ঘটিতেছে, কি উদ্দেশ্যে ঘটিতেছে, তাহা কিছু বলিতে পারেন কি? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—

না। বৃন্তচ্যুত নারিকেল ভূমিতে পড়ে; কিন্তু কেন পড়ে, তাহার উত্তর কোনও বৈজ্ঞানিক এ পর্যান্ত দেন নাই, কেহ দিবেন না। পৃথিবীর আকর্ষণে পড়ে বলিলে, কোনও উত্তরই হইল না; কেন না, পৃথিবী কেন আকর্ষণ করে, তার পরেই এই প্রশ্ন আসিবে। পৃথিবী বিকর্ষণ না করিয়া আকর্ষণ করে কেন, তাহা কে জানে? বিকর্ষণ করিলে অবশ্য আমাদের সুবিধা হইত না, নারিকেল আমাদের ভোগে লাগিত না; কিন্তু পৃথিবী যদি বিকর্ষণই করিতেন, তাহা হইলে আমরা কি করিতাম? বোঁটা হইতে খসিবা-মাত্র যদি নারিকেল তাহার শস্যসমেত ও ক্ষীরসমেত বেলুনের মত উধাও হইয়া উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে পৃথিবীর সহস্র বৈজ্ঞানিক হতাশভাবে ঊর্দ্ধমুখে দূরবীণ লাগাইয়া চাহিয়া দেখিতেন এবং কত মিনিটে কত ঊর্দ্ধে উঠিল, তাহার হিসাব রাখিতেন; কিন্তু নারিকেল ফল রসকরায় পরিণত হইত না। পদার্থ-বিদ্যা খুলিয়া ছেলেরা দেখিত, লেখা আছে, পৃথিবী সকল দ্রব্যকেই আকর্ষণ করেন, কিন্তু নারিকেলের প্রতি তাঁহার অন্য ব্যবহার; নারিকেলকে তিনি টানেন না, ঠেলিয়া দেন। মনুষ্যজাতির সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবী নারিকেলকেও টানিতেছেন, এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ আছি। কিন্তু কেন যে পৃথিবীর এই আকর্ষণ-প্রবৃত্তি, তাহার কোনও উত্তর নাই। হয় ত নিউটনের কোনও পরবর্ত্তী পুরুষ দেখাইবেন, নারিকেল ও পৃথিবীর মাঝে কোনরূপ স্থিতিস্থাপক রজ্জুর বন্ধন রহিয়াছে, যাহার ফলে এই আকর্ষণ; অথবা পিছন হইতে নারিকেল এমন কিছু ঠেলা পাইতেছে, তাহাতেই তাহার ভূ-পতনে প্রবৃত্তি; কিন্তু ইহাতেও সেই 'কেন'র উত্তর মিলিল না। কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছিলেন, পিছন হইতে কণিকা-বৃষ্টির ঠেলা পাইয়া উভয়

দ্রব্য পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই অনুমান সঙ্গত হইলেও, সেই কণিকা-বৃষ্টিই বা কেন হয় এবং ঠেলাই বা কেন দেয়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহ সাহস করেন নাই।

এইরূপ কারণ-অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিকের কতকটা অধিকার আছে বটে; কিন্তু তজ্জন্য কোনও বৈজ্ঞানিক অতিমাত্র ব্যস্ত নহেন। জগতে ঘটনা-পরম্পরা ঘটিয়া যাইতেছে; তজ্জন্য তাঁহার কোনও দায়িত্ব নাই। জাগতিক বিধান বৈজ্ঞানিকের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া চলিয়া যাইতেছে; কোন ঘটনাই তাঁহার পরামর্শ লইয়া ঘটিতেছে না। তিনি কেবল বসিয়া বসিয়া দেখিবার অধিকারী। তিনি যাহা দেখেন তাহাই লিপিবদ্ধ করেন, তাহারই আলোচনা করেন এবং সম্ভব হইলে সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে জীবনের কি কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে, তাহার সন্ধান করেন। জগতে যত ঘটনা ঘটিতেছে, সবই যদি ভিন্ন ভিন্নরূপে ঘটিত, কোনটার সহিত কোনটার কোন সম্পর্ক না থাকিত, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিককে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত। অন্ততঃ তিনি ঐরূপ ঘটনাকে কোনরূপেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন না। সূর্য্য যদি প্রত্যহ পূর্ব্বে না উঠিতেন; দোকান হইতে চাল কিনিয়া ঘরে আসিয়া যদি দেখা যাইত—তাহার অর্দ্ধেক নাই; খাইতে বসিয়া যদি কোনদিন দেখা যাইত—যত খাই তত ক্ষুধা বাড়ে; লুচি ভাজিতে গিয়া যদি দেখা যাইত—কড়াইয়ের ঘি হঠাৎ কেরোসিন হইয়া গিয়াছে; তাহা হইলে বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞান-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিতে হইত এবং মনুষ্যকেও জীবন-যাত্রা-সম্বন্ধে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িতে হইত। সুখের বিষয়, প্রকৃতিদেবীর এইরূপ খেয়াল নাই। প্রকৃতিতে একটা শৃঙ্খলা আছে, সঙ্গতি আছে। আজ যাহা যেরূপে ঘটে

কালও তাহা সেইরূপে ঘটিয়া থাকে। আবার অনেকগুলা ঘটনা একই রকমে ঘটে। কেন সেই শৃঙ্খলা আছে, তাহা আমরা জানি না ; কিন্তু আছে, তাহা দেখিতেছি। বৈজ্ঞানিক, যিনি পরকলা চোখে, মাপকাঠি হাতে, বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন, তিনি এই সকল শৃঙ্খলা খুঁজিয়া বাহির করেন। তোমার আমার চোখে যে শৃঙ্খলা ধরা পড়ে না, বৈজ্ঞানিকের চোখে তাহা ধরা পড়ে। তিনি জাগতিক বিধি-বিধানের আবিষ্কার করেন। নারিকেল ফলের গতির যে নিয়ম, চাঁদের গতিরও সেই নিয়ম, গ্রহগণের গতিরও সেই নিয়ম, আবার জোয়ার-ভাটায় মহাসাগরের অম্বুপৃষ্ঠের উত্থান-পতনেও সেই নিয়ম। ইহা নিউটনের পূর্ব্বে কাহারও চোখে পড়ে নাই ; নিউটনের চোখে পড়িয়াছিল, তাহাতেই নিউটনের নিউটনত্ব।

ফলে বৈজ্ঞানিক কেবল দ্রষ্টা। জগতে যাহা ঘটিতেছে এবং সেই ঘটনা-পরম্পরা যে নিয়মে চলিতেছে, তাহাই তিনি দেখেন। কিন্তু তিনি জগতের কতটুকু দেখেন? এইখানে বলিতে বাধ্য হইব যে, দূরবীক্ষণ আর অণুবীক্ষণ প্রভৃতি সহস্র যন্ত্র সহায় থাকিতেও তিনি জগতের অতি অল্প অংশই দেখিতে পান। কেন না, বিশ্বজগতের অন্ত কোথায়, তাহা তিনি এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং সেই জন্য আপাততঃ জগৎকে অনন্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। পাঁচটার অধিক ইন্দ্রিয় নাই ; এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ও আবার নানা দোষে অসম্পূর্ণ। আচার্য্য হেলমহোৎজ একবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ চক্ষু, উহাতে এত দোষ বিদ্যমান যে, যদি কোনও শিল্পী ঐরূপ নানাদোষ-দুষ্ট যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত, তিনি তাহার দাম দিতেন না। ইন্দ্রিয়গুলির দোষ-

সংশোধনের ও ক্ষমতা-বর্দ্ধনের সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিয়াও জগতের অতি অল্প অংশই তিনি প্রত্যক্ষগোচর করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতের এক আনা প্রত্যক্ষগোচর; পনের আনা অনুমান করিয়া লইতে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এই প্রত্যক্ষগোচর ও অনুমান-লব্ধ জগতের বাহিরে ও ভিতরে জগতের আর একটা বৃহত্তর অংশ কল্পিত হয়, যাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কোনও কথা বলিতেই সাহস করেন না। সেই অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে সুখের বিষয়, বৈজ্ঞানিক ক্রমশই জগতের জ্ঞাত অংশ হইতে অজ্ঞাত অংশে অধিকার বিস্তার করিতেছেন। অজ্ঞাত জগৎ ক্রমশই তাঁহার জ্ঞানের সীমার মধ্যে আসিতেছে। যে অংশ এখনও অজ্ঞাত আছে, সেই অজ্ঞাত অংশ সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম কল্পনা-জল্পনা করেন; অধিকাংশ স্থলে কল্পনা-জল্পনা অমূলক হইয়া দাঁড়ায়, কখনও বা তাহার কিছু একটা মূল পাওয়া যায়। যে সকল অসাধারণ ঘটনাকে আমরা অতি-প্রাকৃত ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা প্রায়ই এই অজ্ঞাত বা অল্প-জ্ঞাত জগৎ হইতেই আসে। তাহার অসাধারণত্ব দেখিয়া আমরা চমকিয়া উঠি; আমাদের পরিচিত জগতের ঘটনাবলীর সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না। পরিচিত জগতের যে সকল ঘটনাবলীকে আমরা নিয়ম-বদ্ধ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে উহারা খাপ খায় না। এই জন্য ঐ সকল ঘটনার সত্যতা-বিষয়ে আমরা সন্দিহান হই। বিজ্ঞান-ব্যবসায়ী বড় সাবধানে চলেন; অনুমান ও কল্পনার উপর নির্ভর না করিলে চলে না বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে তাঁহার সংশয় কিছুতেই মেটে না। বিশেষতঃ যে সকল ঘটনা একেবারে অসাধারণ ও পরিচিত জগতের সহিত অসমঞ্জস, তাহাদের সত্যতা অগ্নিপরীক্ষা করিয়া

না লইলে তাঁহার মনের ধোঁকা কিছুতেই যায় না। প্রত্যক্ষ-লব্ধ কোন ঘটনা যতই অদ্ভুত হউক বা যতই অসাধারণ হউক, তাহাকে অগ্রাহ্য করিবার অধিকার তাঁহার একবারেই নাই। তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে এবং পরিচিত জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আপাততঃ তাহার স্থান দিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে স্থান মিলিবে, এই ভরসায় থাকিতে হইবে। যে কোনও ব্যক্তি একটা অসাধারণ ঘটনার বর্ণনা করিলেই তাহা মানিয়া লইতে বৈজ্ঞানিক বাধ্য নহেন। কেন না, বর্ণনাকারী মনুষ্য অসত্যবাদী না হইলেও ভ্রান্তিপর হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহার সকল কথার উপর ভর দেওয়া চলে না। কিন্তু ক্রুক্‌স বা ওয়ালাসের মত ব্যক্তি যখন কোন অসাধারণ ঘটনার বিবরণ লইয়া উপস্থিত হন, তখন নীরব হইয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। বলা উচিত, জাগতিক কোন ঘটনা যতই অসাধারণ হউক, তাহাকে অতিপ্রাকৃত বলা উচিত নহে। যখনই আমি উহাকে প্রত্যক্ষগোচর করিলাম এবং যখনই উহার সত্যতা অঙ্গীকার করিলাম, তখনই উহা ব্যাবহারিক জগতের অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল; উহা অতিপ্রাকৃত থাকিল না। আধুনিক প্রেততাত্ত্বিকেরা যত অদ্ভুত ও অসাধারণ ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা সমস্তই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে; কিন্তু যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা অতিপ্রাকৃত হইবে না। ব্যাবহারিক জগতে অতি-প্রাকৃতের স্থান নাই।

প্রত্যক্ষগোচর, অনুমানলব্ধ ও কল্পিত, এই তিন অংশ একত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের একটা মূর্ত্তি গড়িয়া লইয়াছেন। বিশ্বজগতের প্রকৃত মূর্ত্তি যে কি, তাহা কোনও

বৈজ্ঞানিকের জানিবার উপায় নাই। তাঁহার যে কয়টা ইন্দ্রিয় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা রূপ, রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ভিন্ন আর কোনও কিছু জ্ঞানগম্য বা কল্পনাগম্য হইবার উপায় নাই। যদি ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অধিক থাকিত, অথবা এই ইন্দ্রিয়গুলিই অন্যরূপ জ্ঞানের আমদানি করিত, তাহা হইলে জগতের মূর্ত্তিও তাঁহার নিকট অন্যরূপ হইত। কেমন হইত, তাহা এখন আমাদের কল্পনাতেও আসে না। আপাততঃ তিনি ঐ রূপ রস গন্ধাদি পাঁচটা বস্তুকে দেশে ও কালে সন্নিবেশিত করিয়া, জগতের এই মূর্ত্তির মধ্যে নানা অবয়ব সন্নিবিষ্ট করিয়া, একটা বিশাল যন্ত্র-কল্পনার প্রয়াস পাইতেছেন। এই যন্ত্রের প্রত্যেক অবয়বের একটা কার্য্য নির্দ্দেশ করা আবশ্যক এবং সকল অবয়বের মধ্যে একটা সম্পর্ক নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। আপন আপন কার্য্য-সাধন করিয়া পরস্পরের সম্পর্ক আশ্রয়ে সেই অবয়বগুলি সুষ্ঠুভাবে যাহাতে সমুদয় যন্ত্রটিকে চালাইতে পারে, ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক সন্তুষ্ট থাকেন। যতক্ষণ তিনি কোন একটা যন্ত্রাঙ্গের কার্য্য নির্দ্দেশ করিতে পারেন না বা সেই যন্ত্রাঙ্গটি কি উদ্দেশ্যে সেখানে রহিয়াছে, নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি হয় না। এইখানে তাঁহাকে বুদ্ধির খেলা খেলিতে হয়। কল্পিত বিশ্ব-যন্ত্রটির পরিচালন-বিধি বুঝিবার জন্য নানা অঙ্গের কল্পনা করিতে হয়, নানা সম্পর্কের কল্পনা করিতে হয়। নিউটন এবং ফ্যারাডে, লাপ্লাস এবং ফ্রেনেল, হেলমহোলৎজ এবং কেলবিন, ম্যাক্সোয়েল এবং জে জে টমসন, ডাল্টন এবং আরিনিয়স, ডারুইন এবং ওয়াইজম্যান প্রভৃতি মনীষিগণ এইরূপ কল্পনার জন্য আপনাদের অসামান্য ধীশক্তি প্রেরণ করিয়াছেন।

তাঁহারা অণু পরমাণু ইলেক্‌ট্রন প্রভৃতি নানা কাল্পনিক পদার্থের ইট পাটকেল জোটাইয়া, স্থিতি গতি মাধ্যাকর্ষণ যোগাকর্ষণ প্রভৃতি নানা কাল্পনিক দ্রব্যের চূণ শুরকি ও কলকবজা জোগাড় করিয়া, জড় আর শক্তি এই দ্বিবিধ অত্যন্ত কাল্পনিক উপাদানে প্রাকৃতিক জগদ্‌যন্ত্রের একটা কৃত্রিম আদর্শ বা মডেল তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহার সাহায্যে প্রাকৃতিক জগদ্‌-যন্ত্রে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু এই কৃত্রিম মডেল সর্ব্বতোভাবে মনগড়া মডেল। এখনও তাঁহাদের কল্পনা প্রাকৃত জগৎযন্ত্রের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দর্শনে সমর্থ হয় নাই। এখনও কোন্ যন্ত্রাঙ্গ কিরূপে কোন্ কাজ করিয়া জগৎ-যন্ত্রকে এমনি ভাবে চালাইতেছে, সর্ব্বত্র তাহার মীমাংসা হয় নাই। জীবনরহিত জড় দ্রব্যে কখন কিরূপে জীবনের আবির্ভাব হইল, জীবের মধ্যে কিরূপে সুখ-দুঃখের বেদনা-বোধ আবির্ভূত হইল, কিরূপে তাহার মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইল, চেতন জীব কিরূপে আবার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি লাভ করিল, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। ডারুইন-বাদী দেখাইয়াছেন, জীবের জীবন-রক্ষার্থ এই সকল ব্যাপারের আবশ্যকতা আছে; অতএব জীব যখন জীবনধারণ করে, তখন তাহাতে এই সকল ব্যাপার ঘটিলে ভাল হয় ও ফলেও তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু জগৎযন্ত্রকে যন্ত্রহিসাবে দেখিলে ঐ ঐ ব্যাপারের কিরূপে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সম্যক্ উত্তর পাওয়া যায় নাই। বলিয়াছি বৈজ্ঞানিকগণের কল্পিত জগৎযন্ত্র প্রাকৃত জগৎ যন্ত্রের একটা মনগড়া আদর্শ বা মডেল মাত্র। এই মডেলের বা নকলের সহিত আসলের কোথাও কোথাও কিছু কিছু মিল আছে মাত্র। এই কল্পিত মডেলে এখনও জীবের ও জড়ের

মধ্যে এবং অচেতন ও চেতনের মধ্যে যে প্রাচীরের ব্যবধান আছে, সেই ব্যবধান সম্যক্ লুপ্ত হয় নাই। প্রাচীরের এখানে একটা ওখানে একটা দরজা ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু জগৎ-যন্ত্রের মণ্ডল এখনও নানা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত রহিয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে অব্যাহতভাবে স্রোত বহাইবার উপায় এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

আর একটা কথার উল্লেখ করিয়া আমার পরমদয়ালু শ্রোতৃগণকে অব্যাহতি দিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীবের যত কিছু চেষ্টা কেবল আত্মরক্ষার জন্য, জীবন-যুদ্ধে বাহ্যজগতের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষার জন্য। মনুষ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য লইয়া বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা স্তূপীকৃত করিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য বাহ্যজগৎকেই আপনার জীবন-রক্ষায় নিয়োগ করা। অরণ্যবাসী মনুষ্য যে দিন ভূমিতে বীজ পুঁতিয়া শস্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল এবং সেই শস্য আগুনে পাক করিয়া আরণ্য ওষধির ফলকে সুপথ্য অন্নে পরিণত করিয়াছিল, সেই দিন সে অজ্ঞাতসারে যে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছিল, পৃথিবীর যাবতীয় লাবরেটারিতে সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী কারখানা অদ্যাপি চলিতেছে। এই আত্মরক্ষার প্রযত্নে ও আত্মপুষ্টির প্রযত্নে আমরা আজ বিস্ময়কর সফলতা লাভ করিয়াছি। দেবরাজের বজ্রে একদিন যাঁহার আবির্ভাব ছিল, তিনি আজ আমাদের গাড়ী চালাইতেছেন, পাখা টানিতেছেন, জল তুলিতেছেন, দূর হইতে সংবাদ বহন করিতেছেন। জাগতিক শক্তিচয়কে আমরা আমাদের কাজে মজুর খাটাইতেছি। কবি-কল্পিত লঙ্কেশ্বর স্বর্গের সমস্ত দেবতাকে ভৃত্যত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের তপস্যা-বলে আমরা প্রত্যেকেই এক একটা লঙ্কেশ্বর হইয়াছি।

যে বাহ্যজগতের আক্রমণে আমরা ব্যতিব্যস্ত, যে বাহ্যজগৎ একদিন না একদিন আমাদের উপরে জয় লাভ করিবেই, আমরা আপাততঃ কয়েকটা দিন তাহার উপর দম্ভের সহিত প্রভুত্ব খাটাইয়া আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তির জয়-জয়কার দিতেছি। কিন্তু ইহাই কি আমাদের পরম লাভ ?

মোটের উপর জগতে যাহা আমাদের অনিষ্টকর, তাহাই আমাদের হেয়, তাহার বর্জ্জনে আমরা সুখলাভ করি ; আর যাহা আমাদের হিতকর, তাহাই আমাদের উপাদেয়, তাহার গ্রহণেও আমরা সুখলাভ করি। জীবের মধ্যে যাহারা সুখভোগে অধিকারী, তাহারা সকলেই তাহা করে এবং করে বলিয়াই তাহারা জীবন-রক্ষায় এমন সমর্থ হয়। আমরা মনুষ্য হইয়াও জীব ; অতএব আমরাও অন্য জীবের ন্যায় জীবন-রক্ষার্থ সুখান্বেষী হইয়া হেয়-বর্জ্জনে ও উপাদেয়-গ্রহণে তৎপর আছি ; তাই আমাদের জীবন-রক্ষার ও জীবন-সমৃদ্ধির অনুকূল যাবতীয় চেষ্টা এই সুখান্বেষণের অভিমুখে। আমরা যে স্বভাবতঃ সুখান্বেষণ করি, তাহার এই নিগূঢ় উদ্দেশ্য। কিন্তু মনুষ্যের একটা বিশেষ অধিকার আছে, ইতর জীবের হয়ত তাহা নাই। মনুষ্য অনেক সময় বিনা উদ্দেশ্যে সুখ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই সুখে তাহার কোন লাভ নাই, জীবন-রক্ষায় এতদ্দ্বারা তাহার কোন আনুকূল্য হয় না ; ইহা উদ্দেশ্য-হীন সুখ ;—ইহা অতি বিশুদ্ধ নির্ম্মল বস্তু, ইহাকে সুখ না বলিয়া আনন্দ বলাই উচিত। মনুষ্য এই বিশুদ্ধ আনন্দের অধিকারী। এই আনন্দে মনুষ্যের কোন হিত ঘটে কি না, এই প্রশ্ন তুলিতে গেলে সেই আনন্দের নির্ম্মলতা নষ্ট হয়। মনুষ্য গান গাহিয়া যে আনন্দ পায়, মনুষ্য কবিতা শুনিয়া যে আনন্দ পায়, নদী-তীরে বসিয়া নদী-স্রোতের কুলু-কুলু ধ্বনি

শুনিয়া যে আনন্দ পায়, সে আনন্দ এই আনন্দের পর্য্যায়ভুক্ত। উহার উচ্চতর সোপানে উঠিয়া প্রকৃতির মূর্ত্তির দিকে কেবল চাহিয়া চাহিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, প্রকৃতির মূর্ত্তিতে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের শ্রী আবিষ্কার করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, উহাও সেই পর্য্যায়ের আনন্দ; তাহাতেও জীবনরক্ষার কোন সুবিধা ঘটিবে কি ঘটিবে না, সে প্রশ্ন তোলাই চলে না। তুলিতে গেলে সেই আনন্দের বিশুদ্ধি ও নির্ম্মলতা নষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক জড় জগৎকে ভৃত্যত্বে নিয়োগ করিয়া জীবন-যুদ্ধে সাহায্য লাভ করিতেছেন বটে; কিন্তু এই জগতের প্রতি চাহিয়া, এই জগতের নিয়মশৃঙ্খলার আবিষ্কার করিয়া, এই জগতের আঁধার অংশ আলোকে আনিয়া, এই জগতের অজ্ঞানাধিকৃত অংশে জ্ঞানের অধিকার প্রসার করিয়া বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ডাইনোমো ও মোটর, বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈদ্যুতিক আলো, ষ্টীমশিপ আর এরোপ্লেন, অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। মানব-সমাজের মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তির মধ্যে বণিকের পণ্যশালা বা বিলাসীর আরাম-নিকেতন কিছুতেই শান্তি আনয়ন করিতে পারে না। মানব জাতির অতীত ইতিহাস পূর্ণ করিয়া জীবন-যুদ্ধের যে ভীষণ কোলাহল আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় বধির করিতেছে, বাহ্যজগতের উপর বিজ্ঞানের এই প্রভুত্ব-লাভের জয়জয়কার সেই কোলাহলের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিকতা-স্পর্দ্ধি-মানব-সভ্যতার মধ্যস্থলেও যখন সবল মানব ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্ব্বল মানবের শোণিত-পানে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তখন জীবন-যুদ্ধের ভীষণতা যে বৈজ্ঞানিকতার প্রভাবে মৃদুতা ধারণ করিবে, মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার কোন

আশ্বাসই নাই। এই ক্রূর সংগ্রামের অশান্তির মধ্যে যদি কিছুতে চিত্তক্ষেত্রে শান্তির বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে উপরে যে আনন্দের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই আনন্দ। বৈজ্ঞানিকের গর্ব্ব এই ও গৌরব এই যে, তিনি ধরাধামে এই আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন; আমরা অঞ্জলি ভরিয়া উহার ধারা-পানে তৃপ্ত হইতেছি। জীবনের সমরক্ষেত্রে পরস্পর যুধ্যমান কোটি মানবের পাদ-পীড়নে যে ধূলিরাশি উত্থিত হইতেছে, সেই ধূলি-বিক্ষেপে এই বিশুদ্ধ আনন্দ-ধারাকে কলুষিত করিও না! প্রচীন ঋষি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞানই আনন্দ ও বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। এই কল্পিত মায়া-পুরীতে বদ্ধ জীব যদি ব্যাবহারিক জগতের সম্পর্কে থাকিয়াও পূর্ণ ভূমানন্দের পূর্ব্বাস্বাদ-লাভে অধিকারী হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎস হইতে যে আনন্দ-প্রবাহ বিগলিত হইতেছে, তাহাকে ব্যাবহারিক জীবনের সুখ-দুঃখের কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া পঙ্কিল করিও না।

সমাপ্ত